শিল্প আঙ্গিক হিসাবে এ্যাপলিক আর্ট,প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।

শিল্পের মর্মে নিহিত অশেষ সৌন্দর্য। আর শিল্পী সৌন্দর্যের সাধনা করে জীবনভর। যিনি শিল্পী তিনি তার ব্যক্তিগত ভাবনাকে শিল্পে রুপ দেবার চেষ্টা করেন। মানসলোকে কত ভাবনার উদয় হয়, সেই বিচিত্র ভাবনাগুলো, মনের আবেগ অনুভূতিগুলো, কল্পনাগুলো তাদের চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটাতে চায় সুন্দর করে, সুন্দর উপায়ে। তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের সেই অভিব্যক্তিগুলো উপস্থাপন করেন। কেউ বেছে নেন রং তুলি ক্যানভাস আবার কেউ বা কাঠ, পাথর, বাঁশ, কাপড়। যে যে মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেটাই তার প্রকাশ মাধ্যম। এই শিল্পমাধ্যমের অন্যতম হচ্ছে এ্যাপলিক। মানুষের শিল্প সাধনার ইতিহাসের ধারায় এ্যাপলিক আর্ট আপন বৈভবে সমুজ্জল। কিন্তু বহুল চর্চিত নয় তবে অনভিজাতও নয়। এ্যাপলিক শিল্প আমাদের দেশে খুব পরিচিত নাম নয়। দেশের স্বনামধন্য শিল্পীগণ একে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে এ মাধ্যমে বিস্তর কাজ করেছেন এরূপ প্রমাণ নেই। সেই কারণেই এই মাধ্যমে খুব বেশী শিল্পকর্ম রচিত হয়নি। হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পীকে দেখা গিয়েছে এই মাধ্যমে শিল্পকর্ম রচনা করতে। তারাও এই মাধ্যমে শেষ পযর্ন্ত স্থির থাকেননি। অন্য মাধ্যম নিয়ে পরবর্তী কালে চিত্র রচনা করেছেন। অথচ এই মাধ্যমে আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হতেই কাজ হয়েছে। সে বিবেচনায় এর ইতিহাসটাও সর্বসাধারনের কাছে স্পষ্ট হওয়া চাই। উল্লিখিত বিবেচনায় বর্তমান বিষয়ে একটা গবেষনা প্রবন্ধ রচনা জরুরি বিবেচিত হয়েছে।

বুৎপত্তিগত দিক থেকে এ্যাপলিক শব্দের অর্থ 'যা ইতিমধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে'। শর্তমতে প্রথমেই Applique শব্দটির অর্থগত ও বুৎপত্তিগত রূপান্তর সম্পর্কে ইতিহাসের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। Applique শব্দটি নেওয়া হয়েছে ফ্রান্স থেকে যার অর্থ দাঁড়ায় decoration, Latin শব্দ Applicare থেকে Applique। এর মানে "Applied" or "Thing that has been Applied" এর past participle হচ্ছে appliquer।[১] (https://en.wikipedia.org/wiki/Applique) । অনুমান করা যায় ১৮০১ সালে এ্যাপলিক শব্দের সাথে প্রথম পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে,তবে এই শব্দ প্রথম ব্যবহার হয় ১৮৬৪ সালে।[২] (www.merrian-webster.com/dictionary/ applique) তার প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয়েছে ১৮০০ সালে করা Hawaiian Quilt। ১৮০০ সালের প্রথম দিকে হাওয়াইন মহিলারা তিন স্তরের কাপড় বিছিয়ে Patchwork Quilt তৈরী করত। উপরের স্তরে থাকত বিভিন্ন রঙের টুকরা কাপড় যা সেলাইয়ের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হত। এ সমস্ত কাজ করত মহিলারা সম্পুর্ন হাতে সেলাই দ্বারা,যার কারণে সম্পুর্ন একটা কাথা তৈরী করতে হাওয়াইন মহিলাদের ১০০০ ঘন্টা সময় লেগে যেত। যখন এটা শেষ হত তখন একটা শিল্পকর্মে রূপ নিত।[৩] (www.thesewingstudio.co.uk/applique-patchwork-Quilting.irs) অন্য আর একটি ওয়েবসাইটে ১৮৩৫ থেকে ১৮৪৫ এর মধ্যে এই শব্দের উৎপত্তি। In the brooded scene applique is a smaller ornaments or device applied to another serface যেখানে অনেক ধরনের উপকরণ ব্যবহার হয়ে থাকে। এটাকে picd work বলা হয়।[৪] (en.m.wikipedia.org/wiki/patchwork) অর্থাৎ সুই সুতার মাধ্যমে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট টুকরা কাপড় একটা বড় পরিসরের জমিনে বসিয়ে জোড়া দিয়ে একটা বড় নক্শা বা চিত্রকর্ম রচনা করা হয়। এই টুকরা কাপড়গুলো জ্যামিতিক আকারেও হতে পারে আবার কোন মোটিফ ও হতে পারে।

তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের সেলাই ব্যবহার করা হয়। যেমন-বুতাম সেলাই, ভরাট সেলাই, ক্রস সেলাই, কাঁথা সেলাই বা রান সেলাই, চেইন সেলাই ও ডাল সেলাই ইত্যাদি। এক কথায় আমরা এভাবে বলতে পারি একটি বড় পরিসরের জমিন কাপড়ে টুকরা কাপড় জোড়া দিয়ে দিয়ে টেক্সচার এবং মাত্রা যোগ করে একটি আলঙ্কারিক নক্শা বা চিত্র রচনা করা হয় তাকেই Applique Art বলা যেতে পারে।

এ্যাপলিক শিল্পের উৎপত্তি কবে কখন শুরু হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এটা অনুমান করা যায় ৫০০০ হাজার বছর আগে Egyptian tomb এবং early age of chaina বা প্রথম যুগের চীনে এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।[৫] (en.m.Wikipedia.org/wiki/patchwork)। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ কাপড় বুনতে শুরু করে Late প্রস্তরযুগে প্রায় ১০০,০০০ বছর আগে মহিষ-ছাগল এবং অন্যান্য বন্য প্রাণী থেকে সুতা তৈরি এবং কাপড় বুনতে শিখে। প্রাচীন ভারতে, চাইনা ও ইজিপ্ট-এ সুতি, লিলেন এবং সিল্ক কাপড়ের আবিস্কার হয় ৫০০০ খ্রিষ্টপূবাব্দে তখন থেকেই এ্যাপলিকের যাত্রা শুরু।[৬] (https://www.facebook.com/notes/taisang-machinery/historical-and-cultura development_-of-appliqué) প্রাচীন জোড়াতালির এবং এ্যাপলিকের ডকুমেন্টেশন যৌক্তিক কারণেই সীমিত। প্রাচীনতম এ্যাপলিকের উদাহারণ "রঙিন হরিণ" মিশরীয় আনুষ্ঠানিক সামিয়ানা ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দপূর্ব। ৬ষ্ট ও নবম শতাব্দী থেকে মোজাইক ধরনের জোড়া তালির এ্যাপলিক দেখা যায়। উদহারণ হিসেবে দেখানো যায় প্রত্যন্ত অঞ্চল সেরিনন্দিয়াতে (Serindia) সিল্ক রুট বরাবর একটি বুদ্ধগুহা আবিস্কৃত হয়। সেখানে এ্যাপলিকের ব্যানার, একটি ছোট সিল্কের ব্যাগ এবং সিল্ক ও রেশমের একটি ট্যাপেস্ট্রী পাওয়া যায়।[৭] (Colby,1958) এরপর মধ্যযুগে আরমর নির্মাণে এধরনের কাঁথার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যাতে সৈন্যরা আরামে থাকতে ও নিরাপদে থাকতে পারে। মধ্যযুগের এই এ্যাপলিকের কাজগুলো ছিল মূলত সহজ জোড়াতালি বা আলংকারিক পূর্ণ যাজক সংক্রান্ত। এগুলো দেয়ালে ঝুলানো থাকতো। মখমল কাপড়ের জমিনে বিভিন্ন ধরনের চামড়ার টুকরা ব্যবহার করে এ শিল্প করা হয়েছিল। এই কাজগুলোতে মরক্কোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৮] (webster, 1929) সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যযুগে ধুমধাম অনুষ্ঠানে এধরনের এ্যাপলিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই কাঁথা বা জোড়াতালির প্রমাণ প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দে "লা লাই দেল ডিজায়ার" নামে একটি ফরাসি সাহিত্যিক কাজে।[৯] (orlofsky & orlofsky, 1974)

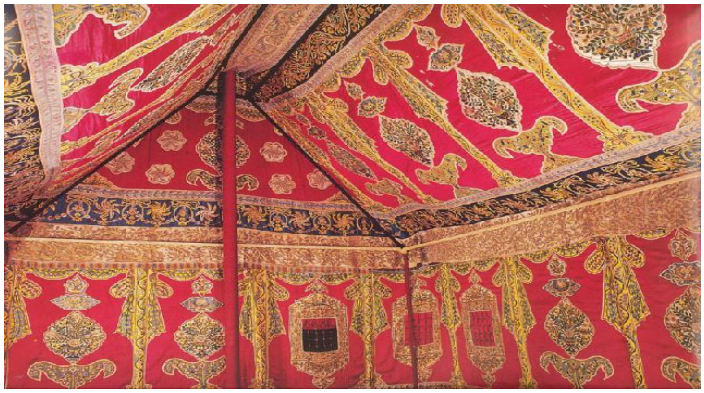

Egyptian tomb এর একটি অনুচিত্র

জাপানেও এ ধরনের আরমর নির্মাণ করতে দেখা যায়। পশ্চিম আফ্রিকার বেনিন এর একটা শহর Abomey তে গুরুত্বপূর্ণ এই Applique শিল্প দেখা যায়, এটি ওখানকার ঐতিহ্যবাহী শিল্প, ১৮ শতক থেকে রাজা ডানহোম এর রাজত্ব কালে এই শিল্পের যাত্রা।[১০] (en.m.wikipedia.org/wiki/patchwork) সুইজারল্যান্ডেও এই এ্যাপলিকের ব্যাপক চর্চা হয়েছে।

ইউরোপে ১১ থেকে ১৩ শতাব্দীতে যখন আবহাওয়া খুবই ঠাণ্ডা থেকে ঠাণ্ডাতর হচ্ছিলো তখন এই ধরনের কাপড়ের চাহিদা বেড়ে যায় এবং উন্নতি লাভ করে। কারণ সাধারণ কাপড় ব্যবহার করার চেয়ে একটু আলঙ্কারিক সুন্দর সৃষ্টিশীল প্যাটার্ন এবং Design এর কাঁথা ব্যবহার করার মানষিকতা তৈরি হতে থাকে।[১১] (en.m.wikipedia.org/wiki/patchwork)

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাণী এলিজাবেথ এর সময় থেকেও লন্ডনে এ শিল্প ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। উদাহারণ হিসেবে Mary, Queens of scots এর একটি কাজ উল্লেখ করার মত "cross stich panel of a spiders web" ("Royal Artist" Jane Roberts.)[১২]

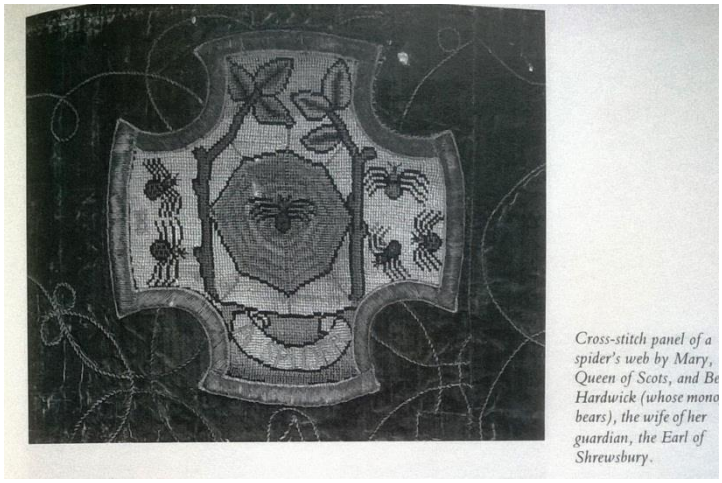

Cross-stitch panel of a spider's web by Mary, Queen of Scots, and Be Hardwick (whose mono bears), the wife of her guardian, the Earl of Shrewsbury.

এটি একটি চমৎকার কম্পোজিশন। রেখা ও ফর্মের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। অতি নিপুন ভাবে শিল্পী এখানে হেম সেলাই ও বুতাম সেলাই এর ব্যবহার করে শিল্পকর্মটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কাজটিতে দেখা যায়, জমিন কাপড়ে আর একটা কাপড় বসিয়ে সিল্ক ও উলের সুতা ব্যবহার করে ক্রস স্টীচ দিয়ে কাজটি করা হয়েছে।

১৬ দশক ও ১৭দশক এই সময় এ্যাপলিক খুবই জনপ্রিয় ছিল। এই সময়ের এ্যাপলিকের কাজগুলোতে মোজাইক এ্যাপলিক প্যাটার্ন ও জ্যামিতিক আকার দেখা যায়।[১৩] Nylen, (১৯৬৮/১৯৭৭)। এই সময় এ্যাপলিক

বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮ শতকে মোজাইক ধরনের এ্যাপলিক প্রথমে দেখা যায় ইংল্যান্ডে।[১৪] (Fitzrandalph, 1954)। তারা ইন্ডিয়া থেকে এই এ্যাপলিক প্রথমে আমদানি করত। সেগুলো ছিল জ্যামিতিক আকারে সমস্ত জমিন জুঁড়ে কাজ।[১৫] (Colby,1958) ১৮ শতকের শেষের দিকে জ্যামিতিক ও বায়মরফিক আকার, ফুল, লতা, পাতা সমন্বয়ে করা কাজগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করে, এগুলোর বেশির ভাগই হাতে তৈরি করা।[১৬] (Orlofsky & Orlofsky,1974) আমেরিকানরা অবশ্য এই কাঁথার ব্যবহার করতে শুরু করেছিল পৃথিবীতে যখন মন্দা ভাব দেখা দিয়াছিল, তখন তারা নিজেদের পুরনো কাপড়গুলো ফেলে না দিয়ে পুনরায় সে কাপড়গুলোকে জুড়ে দিয়ে গরম কাপড় তৈরি করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু আমেরিকা দুইশত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উৎসবে তা আবার দেখা যায়। পরে আমেরিকানরা এই কাঁথা ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করে।

২০০৩ সালে আমেরিকাতে এই কাঁথা প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। আন্তর্জাতিক ভাবে এই কাঁথার প্রদর্শনী হতে থাকে। এবং হাজার হাজার দর্শনার্থীর মন আকর্ষণ করে। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে নিজস্ব অঞ্চলে এর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই কাঁথা অন্যান্য দেশেও রপ্তানী হতে থাকে। এটাকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে কর্পোরেট হাউস এবং গ্যালারি তারা দেখলো এই নতুন মাধ্যমে শিল্প কর্মগুলি দিয়ে ভাল ব্যবসা এর সম্ভবনা আছে। তাই তারা এটাকে আইন সম্মত শিল্পকর্মের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল।[১৭] (en.m.wikipedia.org/wiki/patchwork)

ভারতের কর্ণাটকের Kandhi-তে ও রাজস্থানে এর ব্যবহার দেখা যায়। তাছাড়া গুজরাটে, উড়িষ্যার পিপলিতে এই মাধ্যমের কাজ হয়েছে। তারা বংশ পরম্পরায় এই কাজগুলো করে আসছে। ইন্ডিয়াতে এ্যাপলিক মূলত ধর্মীয় কারণে তৈরি হয়। উরিষ্যার পুরিতে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দির (ritual and traditional) এই মন্দিরকে ঘিরে পূজা পার্বণ,উৎসব হয় মেলা বসে, সেখানে মন্দিরের চারপাশে অনেক সামিয়ানা টানিয়ে, ছাতারমত বানিয়ে, তাবু টানিয়ে দোকানিরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসেন। সেই তাবু বা ছাতাগুলো থাকে খুবই আলঙ্কারিক পূর্ণ। ছাতার সেই নকশাগুলি করা হতো এ্যাপলিকে। সেখানে মোটিফ হিসেবে ছিলো মিথিক্যাল ফিগার, হাতি,টিয়া, ময়ুর, হাঁস, গাছ, ফুল, অর্ধচন্দ্র, সূর্য এবং রাহু, এই কাজ গুলোতে উজ্জ্বল রঙের টুকরা

কাপড়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগুলো মূলত রঙিন কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করে কখনও মেশিন দ্বারা,

গুজরাটে খুবই মান সম্পন্ন এ্যাপলিক পাওয়া যায়। সেখানেও খুবই আলঙ্কারিকপূর্ণ সুই সুতার মাধ্যমে কাজগুলো করা হতো এবং তাদের কাজগুলো দেখলে চেনা যায়, যে এটা গুজরাটের এ্যাপলিক। অর্থাৎ তারা একটা শৈলী বা নিজস্ব ঘরানায় এই এ্যাপলিক করে থাকেন। এই এ্যাপলিক গুজরাটে প্যাঁচওয়ার্ক নামে পরিচিত। গুজরাটের মহিলারা সাধারণত দুই ধরনের এ্যাপলিক করে থাকেন।

এক. তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য

দুই. বিক্রির জন্য

বিহারে এই এ্যাপলিক কাটওয়ার্ক নামে পরিচিত। যখন তারা কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো তখন তারা সামিয়ানা টানিয়ে করতো। সেই সামিয়ানাতে এ্যাপলিক করা থাকতো। নকশা হিসেবে থাকতো পার্সিয়ান ধরনের গাছ, ফুল পশু-পাখি। এটা তাদের পুরোনো ঐতিহ্য।[১৮](www.craft.indianetzone.com.)।

এ্যাপলিক রাজস্থানে গোটা (Gota) এবং কিনারী (kinari) নামে পরিচিত। এদের কাজে রাজস্থানের সৌন্দর্য ফুটে উঠে। সুন্দর সুন্দর রঙের কাপড় তারা ব্যবহার করে। যেমন-লাল, কমলা, গোলাপী, হলুদ রং, সবই – এরা সাধারণত বর্গাকার, আয়তাকার এবং গোলাকার এমনকি মাঝে মাঝে ওভাল আকারে করে থাকেন। মোটিফ হিসেবে দেখা যায় পশু, পাখি, ফুল লতা-পাতা ও মানুষের আকার। জ্যামিতিক আকারও দেখা যায়। এই সমস্ত মোটিফ নিয়ে তারা কাজ করেন।[১৯] (itscorpped.blogspot.com/2013/differaul/applique)

সমুদ্রতীরে গড়ে ওঠা ছোট একটা গ্রাম নাম পিপলী। উড়িষ্যা পুরি শহরের কাছে, এখানে মূলত চাদোয়া নামের এ্যাপলিক তৈরি হয়। এসমস্ত কাজ তারা করে থাকেন ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে। তারা এই কাজের মাধ্যমে তাদের দেবতাকে আত্মোৎসর্গ করেন।

পাকিস্তানে এই এ্যাপলিককে Ralli বলা হয়। Ralli শব্দটি এসেছে স্থানীয় Ralanna থেকে, এর অর্থ হল Mixing এবং Connecting । এই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ লক্ষ করা যায় তাদের ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও ধর্মের কারণে। যেমন-Rilli এবং Rallee ও Rehli। এখানে বিভিন্ন প্যাটার্ন এবং ব্লকের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এই কাঁথার সাথে ৩০০০ বছর আগের ইন্ডাস (Indus) জাতির সাথে মিল খুজে পাওয়া যায়,এবং একই রকমের নকশাঁ,প্যাটার্ন এর সাদৃশ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন মন্দির সিন্ধ (Sindh) এবং বেলুচিস্তানে। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে রং করা মাটির পাএে আশ্চর্যজনক ভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই কাঁথা গুলো প্রধানত সিন্ধ (Sindh), বেলুচিস্তানের গ্রামের মহিলারা করে থাকেন। এই কাজ গুলোতে ভারতের উওর প্রদেশের পাঞ্জাব,রাজস্থান এবং গুজরাটের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন টুকরা কাপড় বর্গাকারে কেটে সুই সুতার মাধ্যমে জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা বড় কাঁথা তৈরী করা হয়। এই কাঁথা তৈরিতে তারা পুরনো কাপড় ব্যবহার করে থাকেন। রঙের মধ্যে গাঢ় রক্তিম লাল,গাঢ় নীল, হলুদ, গাঢ় সবুজ, এবং বেগুনি রঙ ব্যবহার করে থাকেন। এই রঙগুলো সিন্ধ (Sindh) এর কারুশিল্প যার নাম আজরাক (Ajrak) কে উপস্থাপন করে। এপযর্ন্ত তিন ধরনের কাঁথা দেখতে পাওয়া যায়। এই প্যাচওয়ার্ক তৈরী হয় বর্গাকার,ত্রিভুজ আকৃতির টুকরা কাপড় জুরে দিয়ে। আর এ্যাপলিক তৈরী হয় শিল্পীর ইচ্ছানুযায়ী মোটিফ, সেপ এবং প্যাটার্ন দ্বারা। এই সব কাঁথা বিবাহ অনুষ্ঠানে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। এটা তাদের ঐতিহ্য।[20] (http://www.houseofpakistan.com/wonders-handmade-rallis-quilts)।

এখন বর্তমানে এ্যাপলিক একটা জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বহু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই মাধ্যম নিয়ে শিল্প শিক্ষা করছে। তাছাড়া আমি ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি গ্রামে আমার নানী দাদী , মা-খালারা তাদের পুরোনো কাপড়ের পাড় জমাতেন তারপর সেগুলো একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দিয়ে কি সুন্দর মনোমুগ্ধকর ঘরের চালের জন্য চাদোয়া, সামিয়ানা, দস্তরখানা, কাঁথা ব্যাগ কোরআন শরীফের গিলাফ ইত্যাদি তৈরি করতেন।

তার মানে এটাই প্রমাণ করে এই শিল্পের ব্যবহার বহু বছর আগে থেকেই আমাদের দেশে হয়ে এসেছে। এর সমর্থনে শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ এর বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। 'মোগলদের আমল থেকে ব্যবহারিক শিল্প হিসেবে এই মাধ্যমটি চলে এসেছে। রাজা বাদশারা যখন কোনো অনুষ্ঠান করতেন তখন সেই অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ তৈরি বা প্যান্ডেল সাজানো হতো সেই প্যান্ডেল বা মঞ্চ সবই তখন কাপড়ের সামিয়ানা টাঙানো হতো। সেই কাপড়ে এ্যাপলিক করা থাকত। মোটিফ হিসেবে ছিল রাজা রাণী, মানুষ, জীবজন্তু ইত্যাদি।' বর্তমানে এই মাধ্যম নিয়ে বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেছে। ধারণা করা যায় আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকে এই শিল্প মাধ্যমের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যদিও সুনির্দিষ্ট করে সন তারিখ উল্লেখ পাওয়া যায়নি। কারণ এই মাধ্যমটিকে নিয়ে কেউ কখনো লেখালেখি করেনি তবে হ্যাঁ বাংলার নকশিকাঁথা নিয়ে কিছু প্রকাশনা পাওয়া যায়। তাতে এ্যাপলিক বিষয়ে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া কোনো গবেষণাধর্মী লেখা নেই যেখান থেকে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত পাওয়া যেতে পারে।

বিভিন্নভাবে এই শিল্পকর্ম করা যায়। প্রাচীন কালে বা ঐতিহ্যগত ভাবে এই শিল্প করা হয়েছে সম্পূর্ণ হাতে হেম সেলাই আর ব্লাংকেট সেলাই দ্বারা এখন আরো অনেক সেলাই ব্যবহার করা হয়। যেমন-বুতাম সেলাই, ক্রস সেলাই, ভরাট সেলাই, কাঁথা সেলাই ইত্যাদি, অর্থাৎ কম্পোজিশনের প্রয়োজন যেখানে যে সেলাই ব্যবহার করলে ভাল দেখাবে সেই খানে সেই সেলাই ব্যবহার করা হয়েছে।

পদ্ধতি

প্রথমে একটা বড় কাপড় (যেটাকে আমরা জমিন কাপড় হিসেবে জানি) নিতে হবে। এটা নির্ভর করে শিল্পী কত বড় সাইজের শিল্পকর্ম করবে তার উপর তারপর ছোট ছোট টুকরা কাপড় বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন সাইজের আকারের অর্থাৎ শিল্পী প্রথমেই ঠিক করে নেবেন সে কী করতে চায়। কী মোটিভ সে ব্যবহার করে একটা নক্শা বা চিত্র রচনা করবে। একটা খসড়া করে নেওয়া ভাল যেটাকে আমরা লে আউট বলি। আবার খসড়া ছাড়াও চিত্র রচনা করা যায়। শিল্পী তার ইচ্ছে মত কিছু রঙের টুকরা কাপড় বেছে নিবেন। তারপর সেই টুকরা কাপড়গুলো শিল্পীর মনের মতো করে কম্পোজ করবে। কম্পোজিশন বা শিল্প রচনা শিল্পীর একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। তাঁর নিজস্ব ঢংয়ে নিজস্ব আঙ্গিকে তিনি এটা করবেন। টুকরা কাপড়গুলোকে প্রথমে টাক সেলাই দিয়ে জমিনের কাপড়ের সাথে আটকানো হবে। সেটা আঠা দিয়েও লাগানো যায়। তারপর হেম সেলাই করে বা বুতাম ঘর সেলাই দিয়ে টুকরা কাপড়ের চারপাশ সেলাই করবে। এভাবে সব টুকরা সেলাই হয়ে গেলে কাপড়ের ভেতরে কাঁথা সেলাই অথবা ভরাট কিংবা ক্রস ফোর দিয়ে সেলাই কাজ সম্পন্ন করে ফেলবে। এখানে সুতার রঙের দিকটাও লক্ষ রাখতে হবে। কোন রং দৃষ্টি কটু যেন না হয় সমতা যেন থাকে। এসব কাজ একজন শিল্পী তাঁর নিজের হাতেই সম্পন্ন করবেন। কোথাও কোন ফোর বা সেলাই দিলে বা কোন রঙের সুতা ব্যবহার করলে শিল্পকর্মটি যথার্থই হবে সেটা একমাত্র শিল্পী নিজেই ভাল বুঝতে পারবেন। তাই পুরো কাজটি তার নিজের হাতেই সম্পন্ন করতে হবে। এভাবে একটা কাজ সম্পন্ন করতে গেলে একজন শিল্পীর ১-৬ মাস সময় লাগবে।

গ্রামের মহিলারা এই কাজ বা এই কাঁথা যে প্রক্রিয়ায় তৈরী করেন তা হলো ঃ প্রথমে একটা জমিন কাপড় নেওয়া হতো। যেহেতু কাপড়টি পুরানো তাই কাপড়ের বিভিন্ন জায়গায় ছেঁড়া থাকতো। কাপড়ের এই ছেঁড়া জায়গাগুলো ঢাকার জন্য অন্য একটা টুকরা কাপড় ব্যবহার করা হতো। এভাবে কয়েকবার খণ্ড খণ্ড টুকরা কাপড় ব্যবহার করা হতো। কখনো এই কাজটি করা হতো সচেতন ভাবে আবার কখনো করা হতো বাধ্য হয়ে। সেই টুকরা কাপড়গুলো টাক সেলাইয়ের মাধ্যমে আটকানো হতো। তারপর মনের মাধুরী মিশিয়ে বিভিন্ন রঙের সুতায় বিভিন্ন নামের সেলাই দিয়ে তাদের মনের কোনায় থাকা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না মেশানো আবেগ অনুভূতি গুলো তুলে আনতেন বা ফুটিয়ে তুলতেন বিভিন্ন মোটিফ এর মাধ্যমে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের কাঁথা গুলোকে আমরা এ্যাপলিক বলতে পারি। কারণ এ্যাপলিক হওয়ার জন্য যা যা শর্ত প্রযোজ্য এই কাঁথা সেই শর্ত পূরণ করে।এই শিল্পকর্ম করতে বিভিন্ন ধরনের উপাদান ও হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়। সেগুলো হলো সুই , সুতা, পিন, আঠা, পেষ্টিং, কাগজ, বকরম বোর্ড পেপার, কাপড় ও কাঁচি।

বিভিন্ন ধরনের এ্যাপলিক হয়ে থাকে যেমন–

প্যাডেড এ্যাপলিক- Padded Applique

পার্সিয়ান বর্ডার পাড়-Persian or Broderi perse

ইনলে এ্যাপলিক অর মোজাইক এ্যাপলিক- Inlay Applique or mosaic

স্টেইন গ্লাস এ্যাপলিক-Stained glass Applique

স্যাডো এ্যাপলিক-Shadow Appliqu

প্যাচওয়ার্ক এ্যাপলিক-Patch work Applique

রিভার্স এ্যাপলিক-Reverse Applique

বনডেড এ্যাপলিক/কাটওয়ার্ক-Bonded Applique/Cut work।

ফ্রি-স্ট্যান্ডিং মোটিফ-Free Standing motifs
https://www.thesewingstudio.co.uk/Applique-Patchwork-Quilting.irs[২৩]

বর্তমানে শত শত ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কারুশিল্প বিভাগে এই কোর্স অধ্যায়ন করছে। এবং অত্যন্ত সার্থক ভাবেই তারা এই মাধ্যমে শিল্পকর্ম রচনা করছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পরবর্তীতে তারা আর এই মাধ্যম নিয়ে ভাবছেন না বা কাজ করছেন না। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা ১৯৪৮ সালে দেশ ভাগের পর থেকে আমাদের শিল্পগুরু জয়নুল আবেদিন এর হাত ধরে। পশ্চিমা ধাঁচে। আর আমরা সব সময় দেখে এসেছি পাশ্চাত্যে যখন যে মাধ্যমটিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় আমাদের এখানেও তার গুরুত্ব বেড়ে যায়। সেই দিক থেকে শিল্পের মাধ্যম হিসাবে তেলরং, জলরং বর্তমানে এ্যাকরেলিক মাধ্যমটি বহুল প্রচলিত এছাড়াও যে অন্য মাধ্যমে চিত্র রচনা করা যায় তা তাঁরা ভাবতেই চাইতেন না। কাঠ, পাথর, কাপড় শিল্প মাধ্যমে খুবই কম ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় প্রদর্শনীতে ক্যানভাসে আঁকা ছবি। ছাপচিত্র ভাস্কর্য এগুলোকেই গুরুত্ব দেওয়া হত বেশী। কেউ অন্য মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে তাকে উৎসাহ দেওয়া হত না। তার শিল্পকর্ম জাতীয় প্রদর্শনীতে স্থান পেত না। তাই তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তো নতুন মাধ্যমে শিল্পকর্ম করতে। আমাদের দেশে যারা শিল্পবোদ্ধা হিসেবে খ্যাত আছেন যারা শিল্পকর্ম নির্বাচন করেন তারা সবাই ক্যানভাসে চিত্ররচনা করে অভ্যস্ত। খুব স্বভাবতই তারা চাইতো তাদের মাধ্যমগুলো প্রদর্শনীতে আসুক। আরো একটা কারণ আমার কাছে মনে হয় সেটা হল পরিশ্রম বেশী। অনেক সময় লেগে যায়। ধৈর্য ধরে কাজটি করতে হয়। সেটা অনেক শিল্পীই মেনে নিয়ে শিল্পচর্চা করতে আগ্রহী নন। আর একটা বড় কারণ বলে আমার কাছে মনে হয় সেটা হল শিল্পের বাজার। আমাদের সমাজে বিত্তবান, কর্পোরেট ক্রেতা, গ্যালারি এরাই মূলত ছবি কেনেন তো তারা ছবি বলতে ক্যানভাসে রং তুলি দিয়ে আঁকা চিত্রকেই বুঝে থাকেন, ভাস্কর্যকেও বুঝে থাকেন। এছাড়া অন্য মাধ্যমে যে ছবি বা চিত্র রচনা হতে পারে এবং সেটার যে শিল্পমূল্য থাকতে পারে এই ধারণাটাই কম ছিল। আশার কথা হচ্ছে যে বর্তমানে শিল্প শিক্ষার অনেক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চারুকলা বিভাগ চালু হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও গড়ে উঠেছে। যার ফলে শিল্প শিক্ষার মাধ্যমেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে রং তুলিতে ছবি আঁকার তুলনায় শিল্পীরা বিভিন্ন নতুন নতুন মাধ্যম নিয়ে ব্যাপক ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তার প্রভাব আমাদের দেশেও এসে পড়েছে। তাই এখন প্রদর্শণীতে গেলে দেখা যায় নতুন মাধ্যমের শিল্পকর্ম বা চিত্র।

এখন দেখা যাক, বাংলাদেশে এই মাধ্যম নিয়ে কোন কোন শিল্পী কাজ করে যাচ্ছেন বা কতটুকু এই মাধ্যম নিয়ে চর্চা হচ্ছে। এ্যাপলিক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ কে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করলে তিনি বলেন 'মোঘলদের আমল থেকে ব্যবহারিক শিল্প হিসেবে এই মাধ্যমটি চলে আসছে। রাজা-বাদশাহরা যখন কোন অনুষ্ঠান করতেন তখন সেখানে মঞ্চ তৈরি করা হতো। সেই মঞ্চ তৈরি, প্যান্ডেল সাজানো সবই তখন কাপড় দিয়ে সামিয়ানা টাঙ্গানো হতো। সেই কাপড়ে এ্যাপলিক করা থাকতো। মোটিফ হিসেবে ছিল রাজা, রাণী, মানুষ, জীবজন্তু ইত্যাদি'।[২২]

আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এই মাধ্যম শিল্পচর্চা শুরু হয় ১৯৮০সালে। শিল্পী জুনাবুল ইসলাম এবং শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় ও সুনিপুণ চেষ্টার ফল স্বরূপ এই মাধ্যমটিকে চারুকলার পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করেন। এরপর থেকে এই মাধ্যমে প্রতিবছর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ভাল মানের শিল্পকর্ম উপহার দিচ্ছেন। শিল্পীরা নিয়মিত কাজের সুনাম ও পুরস্কারও পাচ্ছেন। তিনি আরোও বলেন 'বাংলাদেশ

স্বাধীন হওয়ার পর কিছু বুটিক হাউস এ্যাপলিক শিল্পটাকে নিয়ে আসে বানিজ্যিকভাবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আড়ং, নিপুণ, অরণ্য বর্তমানে 'যাত্রা' নামে একটি লাইফস্টাইল সপ এই মাধ্যমটি বিস্তৃতভাবে বাজারজাত করেছেন'।[২৩]

বিশুদ্ধ শিল্পচর্চা বলতে যা বুঝায় আমাদের এ মাধ্যমে হয়তো সেইভাবে ততোটা শিল্পচর্চা হচ্ছে না। একজন শিল্পীকে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন বৃত্তির উপর অবলম্বন করতে হয়। জীবিকার পাশাপাশি শিল্পচর্চা ব্যহত হয়। তাছাড়া কর্পোরেট ক্রেতা এবং গ্যালারিগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, যার কারণে এই মাধ্যমে শিল্পকর্ম রচিত তেমন ভাবে হচ্ছে না ফলে উন্নতি হয়নি, বিস্তৃতি লাভ করেনি। তিনি আরও বলেন 'শুধু এই মাধ্যমেই নয় বাটিক শিল্প মাধ্যমটিও উন্নতি লাভ করেনি। এই মাধ্যমকে শিল্প মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে এ্যাপলিক নিয়ে ব্যাপক ভাবে কাজ করতে হবে এবং দীর্ঘ দিন কাজ করতে হবে। কমপক্ষে ১০বছর। যেমন রশীদ চৌধুরী ট্যাপেষ্ট্রী নিয়ে দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন ফলে ট্যাপেষ্ট্রী শিল্প মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে'।[২৪] (সাক্ষাৎকার ১৭ নভেম্বর-২০১৫)।

আর একজন শিল্পী এই এ্যাপলিক নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি হলেন শিল্পী ফারুক আহমেদ মোল্লা, তিনি বেশ ভালোমানের এ্যাপলিক শিল্প রচনা করেছেন। তিনি বিমূর্ত ধারায় তাঁর শিল্পকর্ম করেছেন। কিন্ত পরবর্তীকালে তিনি অন্য মাধ্যম নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন 'দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরির মধ্যে দিয়ে Applique এর যাত্রা শুরু। এই মাধ্যম মূলত ব্যবহারিক শিল্প'।[২৫] পরে ধীরে ধীরে এই মাধ্যম ব্যবহার করে কিছু শিল্পী তাদের শুদ্ধ শিল্পকর্ম রচনা করেন তাও খুব বেশী নয়। তার কারণ হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, একজন শিল্পী প্রথমে তিনি একজন মানুষ, তার পরিবার আছে, সমাজ আছে, তার জীবিকার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ প্রথমে তাকে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে। জীবিকা অর্জন করতে যেয়ে শিল্প চর্চা আর হয় না। যারাও বা চর্চা চালিয়ে যান সেটা একরকম যুদ্ধ করে কারণ তিনি যে চাকুরি করেন। সেটা হবে একধরনের। আর মনের আনন্দ,বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এই সমস্ত আবেগ অনুভূতি নিয়ে কাজ করবেন অন্যভাবে। এতে শিল্পীর দ্বৈত সত্তার পরিচয় মেলে। বাস্তবতার নিরীখে দেখা যায় মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে, যে দিকে সে লাভবান হতে পারবেন সেই দিকে ধাবিত হবেন। শিল্পী যেহেতু এই বৃত্তের বাইরের কেউ নয় তাই সেও ভাবে যে মাধ্যমে কাজ করলে সহজে পরিচিত হওয়া যাবে, আর্থিক সফলতা আসবে, সেই মাধ্যম নিয়ে কাজ করবেন। সেই দিক থেকে শিল্পী ফারুক আহমেদ মোল্লা দেখেছেন Applique এর চেয়ে কাঠ মাধ্যমের শিল্পকর্মের চাহিদা আছে। এতে তিনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। নিজকে প্রকাশ করতে পারবেন সহজে, যদিও তিনি কাঠ মাধ্যম বেছে নিয়েছেন Applique নিয়েও তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং বেশ কিছু শিল্পকর্ম ও রচনা করেছিলেন। তবুও এই মাধ্যম নিয়ে সে আর শিল্প চর্চা করেন নি। নিম্নে তাঁর করা শিল্পকর্মের উদাহারণ হিসেবে দেওয়া হল ঃ

VARIETY-2
Mixed Media

VARIETY-1
Mixed Media

শিল্পী ফারুক আহমেদ মোল্লা

শিল্পী এখানে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন আকারের টুকরা কাপড় ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন রঙের সুতা ও বিভিন্ন ধরনের সেলাই ব্যবহার করে জমিন কাপড়ের সাথে সুনিপুণ ভাবে বিন্যস্ত করেছেন। কাপড়গুলোকে কুঁচকিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে ভাঁজ তৈরি করে টেকচার তৈরি করেছেন ভিন্ন মাত্রা আনার জন্য সব মিলিয়ে একটি চমৎকার কম্পোজিশন। এই চিত্র থেকে বোঝা যায় এই মাধ্যমটির শিল্পমূল্য ও গুরুত্ব অনেক। এই মাধ্যম ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট মানের শিল্পকর্ম রচনা করা সম্ভব তার প্রমাণ এই চিত্রকর্মটি তার কথায় বোঝা যায় ব্যাপক চর্চা ও ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারের অভাবে এই মাধ্যম এখনো সুপ্ত আছে। তার মতে, 'শিল্পী যে মাধ্যম নিয়ে শিল্পকর্ম রচনা করবেন সেই মাধ্যমটির প্রতি তার দরদ থাকতে হবে, সেই বিষয়টি তাকে ভাল লাগতে হবে, আনন্দ পেতে হবে। অর্থাৎ প্রথম শর্তই হল শিল্পী যে কাজ করবে সেই কাজ থেকে তাকে আনন্দ পেতে হবে। আনন্দহীন কাজ ব্যর্থ শিল্পকর্মে পরিণত হবে'।[২৬] (সাক্ষাৎকার ১৫ নভেম্বর -২০১৫)।

শিল্পী ফারহানা ফেরদৌসী তিনি এ্যাপলিক নিয়ে বেশ কিছু শিল্পকর্ম করেছিলেন। এখনো করছেন। তবে ধীর গতিতে, হয়তো তিনি এখনো স্থির করতে পারেননি কোন মাধ্যমে নিজকে তিনি প্রকাশ করতে পারবেন সহজে। ফারহানা ফেরদৌসী ফিগারেটিভ কাজ করতেন। কিন্তু তিনিও বেশি দিন এই মাধ্যম নিয়ে কাজ করতে পারবেন না। তাঁর মতে, 'আমাদের দেশে এই মাধ্যমটির তেমন শিল্পমূল্য নেই। এর কারণ হিসেবে তিনি ব্যাপক চর্চার অভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন 'আবহাওয়া একটা বিষয় , শীত প্রধাণ দেশে এই ধরনের কাজ বেশি হয়। আমাদের এখানে না গরম না ঠান্ডা যেহেতু আমাদের এখানে শীত কম তাই এখানে এই মাধ্যমে কাজ বা শিল্পকর্ম চর্চা বেশি হচ্ছে না'।[২৭] সেই জন্য গ্রহণযোগ্যতাও পাচ্ছে না আর একটা কারণ তিনি মনে করেন যেহেতু এটার ব্যবহারিক দিক বেশি যা বানিজ্যিক ভাবে বেশী কাজ হচ্ছে তাই শিল্পমূল্য কম। তিনি আরও বলেন 'এ পর্যন্ত এই মাধ্যমে কাজ করে কেউ আলোকিত হয়নি বা বিখ্যাত হতে পারেনি। তাই কোনো উত্তরসূরীও তৈরি হচ্ছে না'।[২৮] এর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন এই মাধ্যমের উপকরণ ও করণ-কৌশল খুব সহজ লভ্য নয়। এই মাধ্যমে শিল্পচর্চা একটু সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য যেটা অন্য মাধ্যমে কম। তাই এই মাধ্যমে শিল্প রচনা করতে শিল্পীদের আগ্রহ দেখা যায় না। পরিশেষে তিনি বলেন 'গ্রুপ করে যদি এই মাধ্যমে শিল্পচর্চা করা যায় বা এটা নিয়ে ভাবা যায় কি করে এই মাধ্যমটিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক শিল্পকর্ম করা যায় তাহলে কিছুটা এর প্রচার প্রসার ঘটতো। এবং শিল্পকর্ম রচনা করতে অন্য শিল্পীরা আগ্রহবোধ করত'।[২৯]নিম্নে উদাহারণ হিসেবে তাঁর দুটি কাজ দেওয়া হল ঃ

শিল্পী ফারহানা ফেরদৌসী

শিল্পী ফারহানা ফেরদৌসী প্রথম দিকে, অর্থ্যাৎ একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ করার সময় কিছু এ্যাপলিক করেন। এ্যাপলিকের এই কাজগুলো একটু রিয়ালিস্টিক ধাচের। তিনি ফিগারেটিভ ও ল্যান্ডস্কেপ ধরণের কাজ করেছেন। যেমন তার একটা কাজে দেখা যায়–ফুলে ফুলে শোভিত একটি গাছের ডালে পাখি বসে আছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে তিনি আকাশ ও নদী দেখিয়েছেন। খুবই চমৎকার একটি কাজ, দর্শককে আনন্দ দেবে। পরে তিনি যখন নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তখন আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্প লোক শিল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু কাজ করেছেন। যেমন একটি শিল্পকর্মে দেখা যায় একটি পাখি পিছন ফিরে তাকিয়ে আছে। পাখিটি তিনি সমস্ত জমিন জুরে দাড় করিয়ে দিয়েছেন। তার একপাশে একটি ফুল। নিচে কিছু কথা লিখেছেন। কম্পোজিশনটি দেখলে আমাদের নকঁশি কাঁথার কথা মনে করিয়ে দেয় ।[৩০] (সাক্ষাৎকার ১৫ নভেম্বর - ২০১৫)।

শিল্পী শামীম রেজা, এই মাধ্যম নিয়ে শিল্প রচনা করেছেন এবং এখনো করছেন। তিনি সব সময় চাইতেন একটু ভিন্ন ধরনের কাজ করতে। যে মাধ্যমে আগে কখনও কেউ কাজ করেনি তিনি সেই মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি তাই এ্যাপলিক নিয়ে কাজ শুরু করলেন। ঠিক সেই সময় 'যাত্রা' নামে একটি হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সেখানে তিনি কাজ শুরু করেন। তাঁর কাজ দেখে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্নধর খুব খুশি হন এবং তাকে অনেক উৎসাহ উদ্দিপনা দিতে থাকেন। তারই সর্বাত্বক সহযোগিতার কারণে শিল্পী শামীম রেজা একটি একক প্রদর্শনী আয়োজন করার সুযোগ পান। বাংলাদেশে তিনিই ১ম এই এ্যাপলিক মাধ্যম নিয়ে একক চিত্র প্রদর্শনী করেন ২০০৬ সালে বেঙ্গল শিল্পালয়ে। তারপর থেকে তিনি এখন পর্যন্ত এই মাধ্যম নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি মূলত বিমূর্ত ধারায় কাজ করেছেন। প্রথমদিকে তিনি শিশুশিল্পীদের কাজ দেখে উৎসাহিত হয়ে কিছু কাজ করেছিলেন। পরে ধীরে ধীরে তিনি বিমূর্ত ধারায় শিল্প রচনা করতে শুরু করেন। তার কাজে কখনো পরিচিত ফর্ম কখনও অপরিচিত ফর্ম দেখা যায়। সাথে থাকে বিভিন্ন ধরণের বিটস, শেল, পুতি-কড়ি ও লেসের ব্যবহার। কম্পোজিশন করছেনে দর্জিদের ফেলে দেওয়া টুকরা কাপড় ব্যবহার করে। কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে তিনি হয়তো খুব উন্নত মানের শিল্পকর্ম রচনা করতে পারছেন না। যার কারণে আর কেউ তাকে দেখে এই মাধ্যমে শিল্প চর্চা করতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন না। কিন্তু তিনি এত অল্পতে হাল ছেড়ে দিতে চান না। তাই তিনি ভাবতে থাকেন কি করে এই মাধ্যম কে পরিচিত করা যায়। তখন তার মনে হয় একটা গবেষণাধর্মী লিখা লেখা যাক এই মাধ্যম নিয়ে। যাতে সবার কাছে এই মাধ্যম একটু পরিচিতি পায়। তিনি যেমন বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম রচনা করেছেন এই মাধ্যম

নিয়ে, আবার তেমন সমান তালে বানিজ্যিক ভাবেও কিছু কাজ করেছেন এ্যাপলিক নিয়ে যেটা দিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ হত। অতি দক্ষতার সাথে তিনি তার দ্বৈত সত্তাকে একই সুতায় এনে মিলিয়েছেন। নিম্নে তার কিছু কাজের নমুনা চিত্র দেওয়া হল ঃ

শিল্পী শামীম রেজা

আঃ কুদ্দুছ, ডেপুটি কনজারভেটর, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করে জানা যায় 'কৃষিপ্রধান এই দেশে মানুষের আয়ের উৎস খুবই কম। বেশীর ভাগ মানুষের উপার্জন ক্ষমতা ব্যয়ের থেকে কম। যেহেতু স্বল্প আয়ের মানুষের বাস আমাদের এই দেশে তাই তাদের অনেক ক্ষেত্রে আপোষ করে নিতে হয়। তারা তাদের ব্যবহার করা পুরানো কাপড়গুলোকে ফেলে না দিয়ে জমিয়ে রাখতেন ভবিষ্যৎ কাজে লাগানোর জন্য। পরবর্তীতে এই পুরানো কাপড়গুলো ব্যবহার করে কাঁথা, থলে, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করত। এভাবে আমাদের দেশে এ্যাপলিকের চর্চা হয়ে এসেছে, হয়তো অন্যান্য লোকশিল্পের মত বংশ পরম্পরায় চর্চা হয়নি তাই ঐতিহ্যবাহী শিল্প হিসেবে এটাকে আখ্যায়িত করতে না পারলেও এই শিল্পকে আমরা লোকশিল্পের আওতাধীন বলতে পারি।' [৩১] (সাক্ষাৎকার ১৪ ডিসেম্বর-২০১৫)

শিল্পী ইরানী আহমেদ

ইরানী আহমেদ শিল্পী হবেন ছবি আঁকা শিখবেন, মনের সব ছবি আঁকবেন। এস্বপ্নকে লালন করেছিলেন ছোট বেলা থেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে ব্যচেলর কোর্স শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন একটা হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানে। সেখানে তাঁর বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজের সাথে পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাজ ছেড়ে দিয়ে একটি হস্তশিল্প ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন, এ প্রতিষ্ঠানে এমব্রয়ডারী, এ্যাপলিক, কারচুপি ও মিশ্র মাধ্যমের কাজগুলো মূলত সেলাই নির্ভর। এই কাজগুলো করার পাশাপাশি তিনি খুজতে থাকেন। কোন মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করবেন। এক সময় তিনি শেকড়ের সন্ধান পেয়ে যায়। শেকড়ের সন্ধানে নেমে প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ে আমাদের চিরায়ত গ্রাম-বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী নকশী কাঁথার উপর। কি চমৎকারভাবে গ্রামের মেয়েরা পুরাতন ছেড়া শাড়ীর কাপড়ের উপর কাপড় সঙ্গে নকশী পাড় বসিয়ে বিভিন্ন রংয়ের সুতা দিয়ে মনোহারী নানা নক্শায় ফুটিয়ে তুলেছেন নান্দনিক দৃশ্যাবলী। মনে পড়ে আমাদের আবহমান বাংলার বাউল এবং তাদের টুকরা কাপড় জুড়ে জুড়ে বাহারী রং এর পরিধেয় পোশাকের কথা। এসব কিছুরই বহিপ্রকাশ ঘটেছে শিল্পীর সাম্প্রতিক একটা প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া কিছু কাজে। ছবির মূল উপকরণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে পাটের সুতোর তৈরি একটি বিশেষ ধরনের মোটা কাপড়। বিভিন্ন ধরনের টুকরা কাপড়, জাল, ধাতব সুতা, পুতি, মুক্তা, কড়ি ইত্যাদি। শিল্পীর ভাষায়

"অবশ্য এটা আমাদের দেশীয় শিল্প অর্থ্যাৎ লোকশিল্প এখান থেকেই আমি অনুপ্রাণিত হয়ে এই মাধ্যমে শিল্প রচনা করতে উৎসাহিত হয়েছি। দশ বছর ধরে আমি এই মাধ্যমে কাজ করেছি। তবে হ্যাঁ এটা বলা যায় এই মাধ্যমে শিল্প চর্চা কম হচ্ছে যার কারণে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে না। মানুষের মধ্যে আরো সচেতনা বাড়াতে হবে। তাহলে মানুষের মধ্যে শিল্পদৃষ্টি তৈরি হবে। তিনি আরো বলেন এই শিল্পটার ব্যবহারিক দিক বেশী থাকায় এর শিল্পমূল্য কম। শিল্পমূল্য বাড়াতে হলে বেশী চর্চা আর প্রদর্শনী করতে হবে। যাতে এই শিল্পটার প্রসার ঘটে।[৩২] (সাক্ষাৎকার ১১.০৪.২০১৬, গ্যালারী চিত্রক)। নিম্নে তাঁর কাজের নমুনাচিত্র দেওয়া হল ঃ

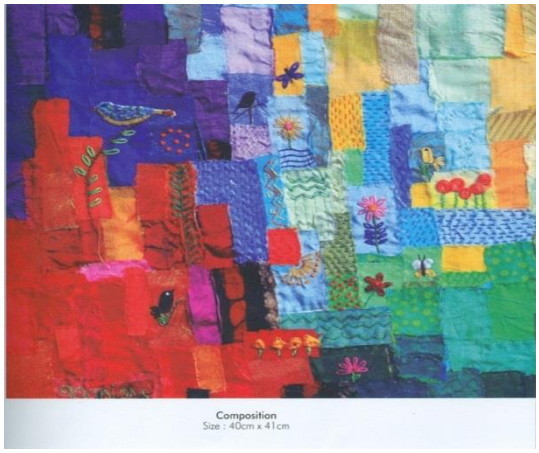

ইরানী আহমেদের এই প্রদর্শনীতে আরো কিছু কাজ দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো এ্যাপলিক বলা যায় না। রঙের ওয়াশের মাধ্যমে করা সেই কাজগুলোকে অনেক চিত্র সমালোচক এ্যাপলিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু না সেগুলো আসলে মিশ্র মাধ্যমে করা শিল্পকর্ম। শিল্পী নিজেও সেই কাজগুলোকে এ্যাপলিক বলেন নি। এ্যাপলিক শিল্পে কখনও রঙের ব্যবহার হয়না। তবে হ্যাঁ কাজ করার আগে শিল্পী প্রয়োজন মনে করলে কিছু টুকরা কাপড় ডাই করে নিতে পারেন।

শিল্পী এই ধরনের কাজগুলোতে প্রথমে এ্যাকরেলিক রং দিয়ে একটা ওয়াশ দিয়েছেন তারপরও টুকরা কাপড় বসিয়ে এ্যাপলিক করেছেন। কোথাও জালের খণ্ড বসিয়ে সেলাই করে দিয়েছেন। কোথাও আবার সুতার বাণ্ডেল জুড়ে দিয়েছেন। তাই এটাকে মিশ্র মাধ্যম বলা যায় এ্যাপলিক নয়। তিনি আরো বলেন- 'এ্যাপলিক আমাদের দেশে এখনো শিল্পের মর্যাদা পায়নি'।[৩৩] **তার কারণ হিসেবে তিনি বলেন ব্যবহার্য দিক মাথায় রেখে আমাদের দেশে এ্যাপলিকের যাত্রা শুরু শিল্পের** দিক তাই উপেক্ষীত রয়ে গেছে।

এখন দেখা যাক অতীত আর বর্তমান এ্যাপলিকের মধ্য কী পার্থক্য চোখে পরে

প্রাচীনকাল থেকে এপর্যন্ত পৃথিবীতে কত ধরনের পরিবর্তন হয়েছে,পরিবেশগত পরিবর্তন,আবহাওয়ার পরিবর্তন,অর্থনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন, এমনকি মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন এসেছে। এর কিছু প্রভাবতো এ্যাপলিক শিল্পে পরবে । মূল পার্থক্য আমি যেটা দেখেছি আগে এ্যাপলিকের কাজ হতো ব্যবহারিক দিক মাথায় রেখে,আর এখন ব্যবহারিক শিল্পের পাশাপাশি বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম রচনা হয়। অর্থাৎ একদিকে যেমন বিশুদ্ধ শিল্প রচনা হচ্ছে অন্যদিকে ব্যবহারিক দিক মাথায় রেখেও কাজ হচ্ছে বিস্তৃত ভাবে। তবে এটা স্বীকার করতেই হয় ব্যবহারিক শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্বে অনেক নিখুত কাজ হত,অনেক ভাল মানের কাজ হত। সেলাইয়ের মধ্যে আন্তরিকতা পাওয়া যেত। সুখ,দুঃখ,হাসি,কান্নার স্বাক্ষ বহন করতো তাদের একেকটা কাজ। এক ধরনের দরদ থাকতো কাজে। তাঁরা একটা সুতা,একটা সেলাই নির্বাচন করত

অনেক চিন্তা ভাবনা করে। তাই তাঁদের একটা কাজ সম্পন্ন করতে সময় লেগে যেত অনেক। কিন্তু এখন দেখা যায় কাজের মান কম,আগের মত এত নিঁখুত কাজ হচ্ছেনা আন্তরিকতাও পাওয়া যায়না। কারণ হিসাবে দেখা যায় আগের দিনের মানুষের অনেক অবসর ছিল,তাঁরা এই কাজ গুলো করতো নিজেদের ব্যবহারের জন্য বাজারজাত উদ্যেশ্য ছিলনা। বর্তমানে মানুষের এত অবসর কোথায় তাছাড়া এখন কাজ গুলো করা হয় বাজারজাত করনের জন্য ব্যবসায়ীক উদ্যেশে। তাই এই কাজ গুলো এত দরদ নিয়ে করা হয় না সময় ও বেশী দেওয়া যায়না কারণ বিক্রয় মূল্য বেড়ে যাবে। বিক্রয় মূল্য বেড়ে গেলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

দ্বিতিয়ত; ফ্যাশন ও স্টাইল এর পরিবর্তন এসেছে, মোটিফ ব্যবহারেও ভিন্নতা এসেছে।

পূর্বে এ্যাপলিক শিল্পের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলনা বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যায়ে এই শিল্প শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী এই মাধ্যমে শিল্প শিক্ষা গ্রহন করেছে যার ফলে এই মাধ্যমে শিল্প চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। শিল্পীরা এই মাধ্যমে শিল্পকর্ম রচনা করছে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই শিল্পের উন্নতি সাধন করছে। যার কারণে শিল্পীরা উপকরণ ও করণ-কৌশল ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন এনেছেন, যেমন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রঙের টুকরা কাপড় ব্যবহারের সাথে সাথে কড়ি,পুতি,মাটির ছোট মুখোশ,কাঠের পুতি,ঝিনুক,রশি,চামড়া ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করতে দেখা যায় যা পূর্বে দেখা যায়নি।

শিল্পীদের এই প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কারণে শিল্পকর্মের গুনগত মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে এর সৌন্দর্য গত দিক ও রুপ,রস বৃদ্ধি পেয়েছে।

চাহিদা ও সংকট

বাংলাদেশ-ই নয় শুধু ইউরোপ আমেরিকাতেও এই শিল্পের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ্যাপলিক শিল্পের ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই এর স্বাক্ষর মিলবে। ২০০৬ সালে শিল্পী শামীম রেজা যখন 'টোকানো রঙ' নামে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল বেঙ্গল শিল্পালয়ে তখন তাঁর প্রায় সমস্ত শিল্পকর্ম বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এরপর টানা দশটি (১০) বছর পার হয়ে গিয়েছে তাঁরপর আর কেউ এই মাধ্যম নিয়ে একক প্রদর্শনী করেনি,এখানেই আমাদের দৈন্যতা সংকট যাই বলিনা কেন। এই শিল্প মাধ্যম নিয়ে চর্চা করে এই দশ বছরে অন্তত আরো পাঁচজন শিল্পী শিল্প প্রদর্শনী করলে এই শিল্পের চাহিদা আরো বৃদ্ধি পেত। অর্থাৎ আমরা শিল্পী সংকটে ভুগছি। তার কারণ ও খুঁজে পেতে সময় লাগেনি আমাদের। আমাদের দেশের মত গরীব দেশে শিল্প চর্চা করে শিল্পীর নিজের খরচে একটা প্রদর্শনী আয়োজন করা সম্ভব নয়। এর জন্য এগিয়ে আসতে হবে গ্যালারী, কর্পোরেট হাউজ এবং বায়ার্সদের। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যারা শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন তাঁরা নবীন শিল্পীদের ক্ষেত্রে সব সময় আগ্রহ দেখান না। তাদের আগ্রহ থাকে বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে এবং বার বার তাঁদের দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন যাতে আয়োজকেরা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হন। যাই হোক ২০১৬ সালে এসে আর একজন শিল্পী ইরানী আহমেদ এই মাধ্যম নিয়ে একক প্রদর্শনী করেন। আমরা আশা করছি এই দৈন্যতা এই সংকট থাকবেনা।

ব্যবহারিক শিল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মানুষের ঘরের জানালায়,বসার ঘরে,শোবার ঘরে এ্যাপলিকের পর্দা, বিছানার চাদর, কুশন কভার ইত্যাদির ঘর-গৃহস্থালী সামগ্রীর ব্যবহার দেখা যায়। এই সমস্ত ঘর সাজানোর ব্যবহারিক শিল্পে যে টুকরা কাপড় ব্যবহার করা হয় তা দর্জিদের ফেলে দেওয়া কাপড়। দর্জিদের এই ফেলে দেওয়া কাপড় এ্যাপলিক শিল্পে ব্যবহার করার ফলে একদিকে যেমন দৃষ্টিনন্দন ও পরিবেশ

বান্ধব পন্যসামগ্রী তৈরী হচেছ অন্য দিকে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে বাস যৌগ্য হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সহায়ক ভুমিকা পালন করছে যা আমাদের জন্য অতিব জরুরী।

বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল সুন্দরবনে এই এ্যাপলিকের কাজ হচ্ছে। দা-কোপ থানার বনলাউডোব ও কৈলাশগঞ্জ এই দুই গ্রামের কিছু মহিলারা এই কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। তার পূর্বে তারা একটি সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাদের কয়েকজন যেমন শর্মিলা ঠাকুর, স্বরসতি, স্বরসতি বরকন্দাজ তাদের পাশের গ্রাম ঢ্যাংমারিতে কিছু মহিলাদের প্রশিক্ষন দিয়েছেন। প্রশিক্ষণ নেয়ার পূর্বে তারা বনে কাঠ কুড়িয়ে, নদীতে পোনা মাছ ধরে, তরমুজ খেতের আগাছা পরিস্কার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাজগুলি অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ ছিল।[৩৪] (মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা-২০১১-২০১৩)

নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, আলোচ্য প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, উপাত্ত, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত এ্যাপলিক শিল্পের গবেষণার জন্য মোটেই প্রতুল নয়– বলা যেতে পারে এর সূচনা মাত্র। গবেষকের নিকট এ সত্য প্রতীয়মান হয়েছে যে, নিবিড় গবেষণায় এ্যাপলিক শিল্পের সৃজন কৌশল, এর উপাদান, উপকরণ, নান্দনিক উৎকর্ষ এবং এর ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্পর্কে আরও অজ্ঞাত সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব।

পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে Applique or Patchwork হচ্ছে ইউনিক আর্ট ফর্ম এবং আমাদের আর্থসমাজ ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অনেক তাই এ বিষয়টি গবেষণার দাবি রাখে, কারণ একটা এ্যাপলিক শিল্পকর্ম আমাদের ইতিহাসের স্বাক্ষ্য হয়ে থাকবে, ঐতিহ্যকে রক্ষা করবে, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ উন্নত করবে। যদিও বাংলাদেশের এই মাধ্যম্যেও শিল্পমূল্য কম তবুও এই মাধ্যম নিয়ে শিল্পচর্চার ও গবেষণার প্রয়োজন আছে এবং প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজন আছে। তাহলেই এই মাধ্যমে শিল্পমূল্য বেড়ে যাবে এবং অন্যান্য শিল্পীরা এই মাধ্যমে শিল্পচর্চা করতে আগ্রহী হবে। অত্যন্ত পরিশ্রম আর সাধনা করে গেলে এই মাধ্যমটি একটি বিশুদ্ধ শিল্প মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

তথ্যসূত্র

১. Website: www.en.m-wikipedia.org/wiki/applique (accessed 18 Desember 2015)

২. Website: www.merrianwebster.com/dictionary/applique (accessed 23Jun 2016)

৩. Website: www.thesewingstudio.co.uk/applique-patchwork-Quilting.irs

৪. Website: www.en.m-wikipedia.org/wiki/patchwork/ Forthe Bobbie Gentry Album(accessed 25 Jun 2016).

৫. www.en.m-wikipedia.org/wiki/patchwork/ Forthe Bobbie Gentry Album(accessed 25 Jun 2016).

৬. Website:https://www.facebook.com/notes/taisang-machinery/historical-and-cultural-development-of-appliqué(accessed 21 Jun 2016).

৭. Colby, A. (1958). Patchwork. London: B. T. Batsford.

৮. Webster, M. (1915). Quilts: their story and how to make them. Marion, Indiana: Doubleday, Page, and Company (1929). (2nd ed.). Marion, Indiana: Doubleday, Page, and Company.

৯. Orlofsky,P. & M. (1974). Quilts in America. New York: McGraw-Hill Book Company.

১০. Website: www.en.m-wikipedia.org/wiki/applique

১১. Website: en.m.wikipedia.org_Helen Page The History of Patchwork and Quilting

১২. Published by Grafton Books 1987 Copyright c jane Roberts 1987,Page-39

১৩. Nylen, A.M. (1977). Swedish handcraft. (A. Harvey, Trans.). NewYork:Van Nostrand Reinhold Company. (Original work published 1968).

১৪. Patchwork. London: B. T. Batsford

১৫. Quilts in America. New York: McGraw-Hill Book

১৬. Orlofsky,P. & M. (1974). Quilts in America. New York: McGraw-Hill Book Company.

১৭ .Website: www.en.m-wikipedia.org/wiki/patchwork/ Quilting in America 2003 edition

১৮ .www.craft.indianetzone.com

১৯ .Itscorpped.blogspot.com/2013/defferaul applique

২০.http://www.houseofpakistan.com/wonders-handmade-rallis-quilts

২১.Website: www.thesewingstudio.co.uk/applique-patchwork-Quilting.irs

২২. অধ্যাপক শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ, ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ সন্ধা ৭ টায় নিজ বাসভবনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. শিল্পী ফারুক আহমেদ মোল্লা, সহযোগী অধ্যাপক, কারুকলা বিভাগ, ঢা. বি। ১৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ সকাল ১১টায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. শিল্পী ফারহানা ফেরদৌসী, সহকারী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, ঢাবি।১৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ সকাল ১২টায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

২৮. প্রগুক্ত

২৯. প্রগুক্ত

৩০. প্রগুক্ত

৩১. আঃ কুদ্দুস, ডেপুটি কনজার্ভেটর, বরেন্দ্র মিউজিয়াম।১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ দুপুর ২:৩০মিনিট বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী,সেগুন বাগিচা,ঢাকা। সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

৩২. শিল্পী ইরানী আহমেদ,১১ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধা ৭টায় গ্যালারী চিএক,ধানমন্ডি,ঢাকা। সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

৩৩. প্রগুক্ত

৩৪. মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার (২০১১-২০১৩)

ক.শর্মিলা ঠাকুর - সুন্দরবন,বনলাউডোব গ্রাম,থানা- দাকোপ।
খ.স্বরস্বতী কর্মকার - সুন্দরবন,বনলাউডোব গ্রাম,থানা- দাকোপ।
গ.স্বরস্বতী বরকন্দাজ - সুন্দরবন,বনলাউডোব গ্রাম,থানা- দাকোপ।